ননী ভৌমিক ঃ অনুবাদে, মৌলিকতায়

মণিদীপা দাশ

অ্যাসোসিয়েত প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চন্দন নগর কলেত

বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরে জন্মেছিলেন ননী ভৌমিক। প্রথমে 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'ধুলোমাতি' উপন্যাস, পরে 'ধানকানা' নামে একতি গল্পগ্রন্থ রচনা, শেষে রাশিয়ান সাহিত্য অনুবাদ - এই তাঁর সাহিত্যকর্ম। ১৯৫৭ -এ অনুবাদকের কাত নিয়ে মস্কো চলে যান তিনি। দু-একবার দেশে এলেও আবার ফিরে গেছিলেন রাশিয়াতে, স্ত্রী স্বেৎলানা-র কাছে। সুদূর প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা খসে যায়।

ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠাকুমার ঝুলি, চারু ও হারু, রাক্ষস খোক্কস - এইসব বই পড়েই গড়পড়তা বাঙালী পাঠকের ছেলেবেলা শুরু হতো। এর পাশাপাশি ছিল বিদেশী রূপকথার অনুবাদ - তা কখনো স্নো-হোয়াইত বা সিন্ডারেলা-র গল্প, আবার কখনো গ্রিম ভাইদের কিংবা দাদুর দস্তানার কাহিনী। অনুবাদ হ'লেও ছোতদের পক্ষে এগুলি সহজগম্য ছিল। লীলা মতুমদার, নৃপেন্দ্রকৃষত চট্টোপাধ্যায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়- এঁদের দক্ষতাই অপরিচিত অথবা অর্ধপরিচিত ভাষায় লেখা গল্পকে বাঙালী পাঠকের চেনাজগৎ করে তুলতে পারত। রাশিয়ান ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে অরুণ সোম, সমর সেন - এ ধরণের কয়েকতি নাম করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি অনুবাদ করেছিলেন ননী ভৌমিক। শুধু মাত্র শিশু সাহিত্য নয়; কিশোরপাঠ্য লেখা এবং চিরায়ত সাহিত্য - সর্বত্রই তিনি অনায়াসবিচরণ করেছেন। তার অনুবাদ করা যে বইগুলি এখনও বহুপাঠকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে পাওয়া যায়, তার কয়েকতি হ'ল -

১. ইউক্রেনের লোককথা (দস্তানা, রায়বাহাদুর মার্তরচাঁদ, বেড়াল আর মোরগ ছানা, গড়ানে মতর, বুড়োর মেয়ে আর বুড়ির মেয়ে, তেলেসিক ইত্যাদি গল্প) - রাদুগা, ১৯৮৮
২. পেনসিল আর সর্বকর্মার অ্যাডভেঞ্চার (ইউরি দ্রুতকভ) - প্রগতি, ১৯৭৪
৩. বাচো আর গোচা (ওতিয়া ইউসেলিয়ানি) - প্রগতি, ১৯৭৫
৪. সোনার পেয়ালা (কায়ুম তাংগ্রিকুলিয়েভ) - রাদুগা, ১৯৮৯
৫. সোনার চাবি কিংবা বুরাতিনোর কান্ডকারখানা (আলেক্সেই তলস্তয়) - রাদুগা, ১৯৮৮
৬. উভচর মানুষ (আলেক্সাণ্ডর বেলায়েভ) - রাদুগা, ১৯৭৩
৭. বঞ্চিত লাঞ্চিত (ফিওদর দস্তোয়েভস্কি) - প্রগতি, ১৯৭৮
৮. আন্না কারেনিনা ২ খন্ড (লিও তলস্তয়) - রাদুগা,১৯৮৩

তাঁর সম্পাদনা করা দুতি বইও আছে - একতির নাম 'চুক আর গেক' (প্রগতি, ১৯৮০), অন্যতির নাম 'তিমুর ও তার দলবল' (রাদুগা, ১৯৮৩)। দুতিই আর্কাদি গাইদারের লেখা।

ননী ভৌমিকের মৌলিক রচনার মধ্যে আছে 'ধানকানা' নামে একতি গল্প সংকলন এবং 'ধুলোমাতি' নামের উপন্যাস। 'ইশারা' নামে তাঁর একতি লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে তাঁর অনুবাদগুলি এককথায় অনবদ্য। পরিচিত আবহ, চেনা-নাম এসব না থাকলেও অনূদিত লোককথা ও রূপকথার গল্পগুলি এমন স্বচ্ছণ্ড ও অনায়াস ছিল যে, দেশী বিদেশীর ভেদরেখাতা ছিল অদৃশ্য। উদাহরণ দেওয়া যাক - ''বন দিয়ে চলেছে দাদু, পেছন পেছন কুকুরতা। যায়, যায়, যায় - দস্তানাতি ওদিকে পড়ে গেল। ছুতে এল নেংতি-ইঁদুর, দস্তানার ভেতর ঢুকে বললেক্ষ্ম এইখানে থাকব আমি। এই সময় তিড়িক তিড়িক - এল ব্যাঙ। জিগ্যেস করলেক্ষ্ম

- কে গো, কে থাকে দস্তানায়?
- কুতুর-কুতুর নেংতি ইঁদুর। কিন্তু তুমি কে?
- তিড়িক-ঠ্যাঙ ব্যাঙ। আমাকেও ঢুকতে দাও!
- এসো।

আর এমনি করে দৌড়-খোশ খরগোশ, সেয়ানা-দিদি শেয়ালি, ছেয়ে-ধেবড়ে নেকড়ে, দাঁত-ফোঁড় বনশুয়োর, বনের-তালুকদার ভালুক, সবাই মিলে ঢুকলে দস্তানার এপাশতিতে, ওপাশতিতে। এমন সময় দাদু ফিরলো দস্তানা খুঁজতে। কুকুর ছুতলো আগে আগে - দেখলো দস্তানা পড়ে আছে, নড়ছে। ঘেডঘেউ শুনে ভয় পেয়ে দস্তানার সাততন যে যেদিকে পারলে দৌড় দিলে। দাদু এসে কুড়িয়ে নিলে নিতের তিনিসতা।''

এই গল্পে অনুবাদক অনুপ্রাসকে স্মরণে রেখেছেন, তা বোঝা যায় বিশেষ্য বিশেষণ গুলির দিকে তাকালে- যথা- দৌড়খোশ / খরগোশ, তিড়িকঠ্যাঙ / ব্যাঙ, ছেয়েধেবড়ে / নেকড়ে ইত্যাদি। অনুপ্রাস একতা মিলের দোলা দেয় - আর মিল দেওয়া শব্দ মানুষের স্মৃতিতে প্রবেশ করে সহতে - থেকেও যায় বহুকাল। এই আভ্যন্তর বৈশিষ্টতি কিন্তু পরবর্তীকালে, ১৯৯২-তে, 'ভস্তক' থেকে প্রকাশিত 'দাদুর দস্তানা' নামের

বইতিতে অনুপস্থিত এবং সেখানে অনুবাদকের নাম নেই! সেখানে বিশেষণ গুলি এইপ্রকার - দৌড়-বাত খরগোশ, লম্ফ-মহারাত ব্যাঙ, চোখা-নাক নেকড়ে, ইত্যাদি। এখানে বিশেষ্যগুলি 'যে সেরা দৌড়ায়', 'যে সেরা লাফাতে পারে', 'যার সুঔর নাক' - এই ধরনের সেরার শিরোপায় চিহ্নিত। মূল গল্পে কিন্তু সবাই খুব সাধারণ, সেতন্যই ছোট্টো দস্তানার মধ্যে তারা গায়ে গায়ে লেপ্টে থেকেছে, কিন্তু কোনো আশ্রয় প্রার্থীকে ফেরায় নি। এমন কি, তাদের মধ্যেকার খাদ্যখাদক সম্পর্কতাও প্রতিবেশী সম্পর্কে পরিণত হয়ে গেছে!

'তেলেসিক' গল্পতি অনুবাদ করা হয়েছে মুখে-মুখে-বানিয়ে-বলার ভঙ্গিতে। তেলেসিক তন্মেছিল একতা কাঠের পায়া থেকে, বা বলা যায় এক নিক্ষ্মসন্তান বুড়োবুড়ির স্বপ্ন থেকে। আর তারপর -
'যখন হল নওল কিশোর, ছেলে বললে - "বাবা আমায় সোনার নাও, রুপোর বৈঠা বানিয়ে দাও - না ; নদীতে মাছ ধরব, তোমাদের খাওয়াব।" বুড়ো বানাল সোনার নাও, রুপোর বৈঠা। নৌকা ভাসল নদীতে।'
বুড়ি-মা রোত খাবার নিয়ে নদীর পাড়ে এসে ছেলেকে ডাকে - "তেলেসিক, সোনা আমার / রেঁধেছি তোর তইয়ের মাড়, / নৌকো ভেড়া নদীর পাড়।" এই ছড়া নকল করে নাগিনী তেলেসিককে বণ্ডি করল বতে, কিন্তু অচিরেই সেই নাগিনীর কন্যাতিকে তণ্ডুরে ফেলে রান্না করল এবং হাঁসেদের কাছে 'ছড়া' বলে, তাদের সাহায্যে পালাল। একতি ছড়া উদ্ধৃত করা যাক - "হাঁস, ওগো হাঁস, হাঁসের পো, / আমায় নিয়ে চলো গো, / সবাই আছে পথ চেয়ে, / দরদি তুমি সবার চেয়ে, / নইলে নাগে ফেলবে খেয়ে!" এই অপরূপ ছড়া নির্মাণক্ষমতা নিশ্চয় বুড়ি মা-র উত্তরাধিকার, যা শুনে দয়ার্দ্র হাঁসেরা তাকে উড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গেল, পেতভরে গম খেল, ফের উড়ে গেল আকাশে। এরপর লেখা আছে-
"আমার কথাতি ফুরলো, একসার পিঠে তুড়লো।"
আমাদের মনে পড়ে যায় রূপকথার শেষে "নতে গাছতি মুড়লো" এই বাক্যাংশ - কিন্তু এখানে যেন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে যে, পিঠে তুড়োতে যততা সময় লাগে, গল্পতা চলেছিল ততক্ষণ ধরে। 'রায়বাহাদুর মার্তদচাঁদ' - এ গল্পতি আমাদের উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সৃষ্ট মতন্তালি সরকার নামক বেড়ালতিকে মনে করিয়ে দেয় - যে শুধুমাত্র বীরত্বের ভান করে অন্যদের থেকে সুবিধে আদায় করত।

'বুড়োর মেয়ে আর বুড়ির মেয়ে' -র সঙ্গে সুখু-দুখুর গল্পের মিল আছে। ভাল আচার ব্যবহারের তন্য বুড়োর মেয়ে তার কর্ত্রী, আপেল গাছ, উনুন, ঝর্ণা, কুকুর - এদের কাছ থেকে পেয়েছে যথাক্রমে প্রচুর ভাল তিনিস, সোনারুপোর আপেল, মিষ্টি রুতি, সোনার তলা আর হাতা এবং লম্বা সুঔর মালা। বুড়ির মেয়ে কিছু পশুর মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই পেল না, কারণ সে কারুর তন্য কিচ্ছুতি করেনি। এ গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, তীবনযাপনের মৌলিক নীতিগুলি সবদেশেই অভিন্ন।

আর এক প্রকার থিম আছে, যেখানে কোনো সাধারণ যুবক বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে লাভ করে রাতকন্যাকে। এ ধরণের গল্পগুলো যেন বুঝিয়ে দেয়, যে কর্মই শেষ কথা। গড়িয়ে-যাওয়া- মতরদানা থেকে তন্ম নেওয়া 'গড়ানে মতর' নামের তরুণ, তার সাহস আর শক্তি দিয়ে দুর্ধর্ষ নাগের কবল থেকে ভাইবোনদের উণ্ডার করল, ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করল, অবশেষে রাতকন্যার হাত ধরে নতুন পৃথিবীতে সংসার পাতল। চাষীর ছেলে ইভান-পালোয়ান নাগদের রাত্র ইরদ-কে মেরে তার পরমাসুণ্ডরী কন্যাকে বিয়ে করল। এগুলি প্রকারান্তরে সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প।

'বাচো আর গোচা' হল উপকার- প্রত্যর্পণ এবং প্রতিবেশিত্বের কাহিনী। বাঘ-মায়ের দুধ খেয়ে বেড়ে-ওঠা বাচো বাঘ-ভাইদের বিপদের দিনে এগিয়ে যায়। প্রতিবেশী গোচাও যায় এবং তার সাহায্যেই নীল-ভুরু বাঘ-ভাই মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসে। 'সোনার পেয়ালা' -র গল্পগুলিতে বালক আর্সলান দাদু রহিম আগার কাছে প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতি পরিচয়ের পাঠ নিয়েছে। 'পেনসিল আর সর্বকর্মার অ্যাডভেঞ্চার' শিশুপাঠ্য উপন্যাস। সর্বকর্মা লোহার তৈরী এক মানুষ-পুতুল আর অন্যতন যাদুপেন্সিল - সে যা আঁকে, তাই-ই সত্যি হয়ে যায়। ভুলভাল আঁকার ফলে কিছু অবাঞ্ছিত সমস্যা তৈরি হয় বতে, কিন্তু ছোতবাচ্চার ছবি এঁকেই তারা প্রুতিয়া-খোকনকে পায়। বন্ধুত্ব ও বাৎসল্য দিয়ে গড়ে ওঠে না-মানুষদের সংসার। 'সোনার চাবি কিংবা বুরাতিনোর কান্ডকারখানা' উপন্যাসে লম্বা-নাক কাঠের-পুতুল বুরাতিনো প্রথম দিকে স্বেচ্ছাচারিতা করলেও তার নির্মাতা গরীব বুড়ো কার্লোবাবাই তাকে চরম বিপদের দিনে চার শত্রুর হাত থেকে বাঁচায় এই ভাবে– "কাঁধ দিয়ে সে ধাক্কা দিল কারাবাস বারাবাসকে, কনুই দিয়ে দুরেমারকে, লাঠি বসাল আলিসা শেয়ালের পিঠে, বুত দিয়ে লাথি মেরে দূরে ছুঁড়ে দিলে বাত্তিলিও বেড়ালকে-"। এসব গল্পে যে সব সদর্থকতার কথা আছে, তা সৃষ্টির গৌরব লেখকের, আর অনুবাদে সেই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর করে তোলার কৃতিত্ব ননী ভৌমিকের। বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বাগভঙ্গি, অনুকার শব্দ, বিশেষ্য/বিশেষণ, ক্রিয়া/ক্রিয়াবিশেষণ- এগুলি সাবলীল ভাবে অনুবাদে ব্যবহার করেছেন তিনি। পূর্বোক্ত উক্তিতি একতি অনায়াস যৌগিক বাক্য। অপর উদাহরণ গুলি এই প্রকার-
তবিশেষ্য - ন্যাতাকানি, ধরাধাম, সলাপরামর্শ, যত্নআত্তি, নাতাই, সাঁঝ ইত্যাদি।
তবিশেষণ - কতরমতর কথা, ঘুরঘুতি অন্ধকার, বিদিকিচ্ছিরি অভ্যেস, চাড্ডিখানি কথা ইত্যাদি।
তক্রিয়া - হাত নিশপিশ করছে, উপায় ঠাওরেছি, নিকুচি করেছে, ডুবে মলুম, অক্কা পাবি ইত্যাদি।

তক্রিয়াবিশেষণ - তড়িঘড়ি উঠতে লাগলাম, সাপের মত হিসিয়ে বল্লে সিঁধেল ইত্যাদি।
তঅনুকার শব্দ - রান্নাবান্না, ভাতঅতাত্ত, গুতিয়ে বাতিয়ে ইত্যাদি।
তবিশিষ্ট বাগভঙ্গি - নড়ন চড়ন নেই, পেত চোঁ চোঁ, ভোঁ-দৌড়, মাইরি বলছি, যত ঢং, হু হু করছে বাতাস, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, না আছে পশু না আছে পাখী, অকম্মার ঢেঁকি, দন্ডবৎ হই মাঠাকুরণ, সাত সতের ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার পরিচিতি বিশিষ্টতা বিদেশী আবহের সঙ্গে মিশে গিয়ে, ননী ভৌমিকের অনুবাদকে বাঙালী পাঠকের 'Comfort Zone' করে তোলে। তাঁর অনূদিত কিশোরপাঠ্য উপন্যাস 'উভচর মানুষ' -ও মনোরম চেনা আবহাওয়ার-র অপর একতি উদাহরণ। সেখানে মূল চরিত্র ইকথিয়ান্ডর। সে মানুষ; তবে বিশেষ কারণে, তলে ও স্থলে সমান স্বচ্ছণ্ড। রূপসী গুত্তিয়েরে-কে ভালবেসে, তার সঙ্গে কথা বলবার তন্য ডাঙায় বেশীক্ষণ সময় কাতিয়ে, তরুণতির বিশিষ্ট শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে। মুক্তালোভীদের ষড়যন্ত্রে তহাতে বণ্ডী হয় সে। স্থলে, তার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী অলসেন বুঝতে পারে, যে, এদের কবল থেকে ইকথিয়ান্ডরকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সমূদ্র। স্থলের মানুষের পক্ষে যেতা বাধা, তার পক্ষে সেতাই মুক্তি। ড. সালভাতর অন্যান্যদের বহু চেষ্টায় সে সমুদ্রে ফিরতে পারে। কিন্তু আগে সে মাছ ও অন্য সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে যে প্রশান্তিতে থাকত, সে প্রশান্তি আর থাকে না। মাতির পৃথিবীকে ভালবাসা, নিত্তের তন্য সঙ্গী খুঁততে চাওয়া - তা আসলে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার সমান-আর তাই তার পক্ষে স্বর্গ থেকে বিদায় অবশ্যম্ভাবী। এই কাহিনীর মানবিক আবেদন তীব্র, তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছে অনুবাদের ভাষা। উদাহরণ দেওয়া যাক-

"নিক্ষ্মশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?"

'হ্যাঁ বাবা - বললে ইকথিয়ান্ডর।'

'তোমারই দোষ' - বললেন সালভাতর, 'ডাঙায় অত বেশি সময় থাকা তোমার উচিত হয় নি।'

মাথা নিচু করে কি ভাবতে লাগল ইকথিয়ান্ডর। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে সোত্তসুতি সালভাতরের দিকে চেয়ে শুধালক্ষ্ম

'কিন্তু কেন উচিৎ হয়নি বাবা? সবাই থাকে আর আমার চলবে না কেন?

মামলায় তবাব দেবার চেয়েও তিরস্কার ভরা এই দৃষ্টি সহ্য করা সালভাতরের পক্ষে কঠিন হয়েছিল। তাহলেও দমলেন না তিনি।

'তার কারণ তুমি এমন একতা তিনিস পারো যা আর কেউ পারে না। তলে ডুবে থাকতে পারো তুমি.... কোনতা তুমি চাইবে ইকথিয়ান্ডর, সবাই যেমন থাকে তেমনি ডাঙায় থাকা, না কি কেবল তলে থাকা?'

'তনি না' - একতু ভেবে বললে ইকথিয়ান্ডর। তলতলের তাৎ আর ডাঙা, গুত্তিয়েরে - দুই-ই তার কাছে সমান প্রিয়। কিন্তু গুত্তিয়েরেকে তো এখন আর সে পাবে না ...

'এখন আমি সমুদ্রই চাইব' – বললে ইকথিয়ান্ডর।"

ইকথিয়ান্ডরের দ্বিধা এবং বেদনা সহত্তেই অনুমেয়। এখন থেকে সমুদ্রের তলাতেও অসুখী তীবনের ভার নিয়ে ভেসে বেড়াতে হবে তাকে!

দস্তোয়েভস্কি-র বিখ্যাত উপন্যাস ' উনিঝোন্নিয়ে ই অস্কোর্লিয়েন্নিয়ে' (৪ খন্ড) - র অনুবাদ করেছিলেন ননী ভৌমিক, নাম দিয়েছিলেন 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত'। এই রুশী লেখকের লেখায় মানুষের প্রায় সর্বপ্রকার অনুভূতির প্রকাশ আছে। এতিও তার ব্যতিক্রম নয়। অনুবাদক সে বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা রেখেছেন। দস্তোয়েভস্কির কাহিনীর নায়ক বা নায়িকাদের অধিকাংশের তীবনে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী। পরিস্থিতির তাড়না তাদের প্রায়শঃই আছড়ে ফেলে দুর্ভাগ্যের পাথরে, বারে বারে অবিন্যস্ত হয়ে যায় চেনা ছকের তীবন - এবং এর তন্য মাঝে মাঝে তারা নিত্তেরাও দায়ী। এ উপন্যাসে নেল্লী, তার মা ও দাদু স্মিথ, নাতাশা ও তার বাবা - সকলেই দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছেন নিত্তেদের তীবনে। প্রথম তিন তন মারা গেছেন - বাকী দুতন কোনোমতে 'ego' র বাইরে আসতে পেরে বেঁচে গেছেন। প্রিন্স ও আলিওশা সকল ঘতনার মূল কারণ হলেও লেখক কাহিনীতি তাদের দিক থেকে দেখান নি। অনুবাদকও তাই করেছেন, তবে নেল্লী ও কথক চরিত্রনির্মাণে এবং তাদের মধ্যকার অনামা সম্পর্কতির বয়নে বিশেষ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। কথক ইভান পেত্রোভিচ তীবনের বাস্তব ঘতনাগুলিকে সাহিত্যের উপকরণ হিসেবেও দেখেছে-ফলে তার মানবিক এবং সাহিত্যিক আগ্রহ পরস্পরের সঙ্গে তড়িয়ে গেছে। সমস্ত অভাগার প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম প্রীতি ও স্বার্থপরতার বদলে ভালবাসার পক্ষ নেবার স্বাভাবিক প্রবণতার কারণে বারে বারে অপরের ভাগ্য ও তীবনের সাথে তড়িয়ে পড়েছে।

এ উপন্যাসের কাহিনী দুতি পরস্পরসদৃশ। প্রিন্স নেল্লীর মা- কে প্রতারণা ও পরিত্যাগ করেছেন; প্রিন্সপুত্র আলিওশা নাতাশাকে পরিত্যাগ করে কাতিয়াকে গ্রহণ করেছে। নেল্লীর মা-কে তাঁর পিতা ক্ষমা করেন নি; নাতাশার বাবা মেয়েকে অভিশাপ দিয়েছেন, যদিও পরে দেখা গেছে যে ফিরে-আসা মেয়েকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছেন। বাৎসল্য এখানে তেদ-কে ছাপিয়ে গেছে। প্রতেস্তান্ত ধারণায় ঈশ্বর অকরুণ এবং দন্ডদাতা। কিন্তু লেখক পেশ করেছেন এই ধারণার বিপ্রতীপ ভাষ্য - সেখানে আছে প্রেম, সৌভ্রাত্র, ক্ষমা।

এখানে একদিকে রয়েছে কয়েকজন অহংসর্বস্ববাদী নির্লজ্জ মানুষ - অপর দিকে আছে বঞ্চিত লাঞ্ছিতেরা যারা লাঞ্ছনাকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ, কিন্তু অপরাপর উৎপীড়িতের প্রতি সহানুভূতিশীল। বহু স্তরে বিন্যস্ত, অনুভবপ্রধান এই উপন্যাসটিতে আছে ভাষার ঐশ্বর্য। চিত্তগহনের তানাপোড়েন-ও এখানে উল্লেখযোগ্য। ননী ভৌমিক ঐ সবকটি বিষয়েই মনোযোগ দিয়েছেন। অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি পেয়ে নেল্লী যে কত অল্প সময়ের মধ্যে যথাক্রমে সন্ত্রস্ত, ভীত, প্রত্যাঘাতপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে এবং তার পর খুশী হয়ে উঠে সেই খুশী গোপনের প্রাণপণ চেষ্টা করতে পারে, তার বিস্তৃত ও বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা অনুবাদে আছে। মেয়ে নাতাশার প্রতি একাধারে ক্রোধ এবং অপ্রমেয় ভালবাসা যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশ করতে চেয়ে অনুবাদক নিকোলাই সের্গেয়িচের কথাগুলিকে অনেক সময় অসমাপ্ত রেখেছেন। যথা-

"আমি যে কতবার গেছি তোকে দেখতে - কেউ জানত না - গিয়ে দাঁড়াতাম তোর জানলার নিচে - অন্ততক্ষ্ম জানলায় তোর ছায়াটা দেখতে - শীতের সময় - গভীর রাত - অন্ধকার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে থেকেছি তোর দরজায় - তোর গলা কি শুনতে পাব না?" লেখক অনেক সময় দেখিয়েছেন যে সব সাধারণ মানুষ মানবিক অধিকার থেকে নানা ভাবে বঞ্চিত, তাদের ভেতর থেকেই অংকুরিত হয় প্রতিবাদ। লেখকের এই মনোভাবের তো বিশ্বজনীন স্বীকৃতি আছেই। অনুবাদকও সম্ভবতঃ অভিন্ন মতের পোষক, তাই নেল্লী ইভানকে অনুরোধ করে তার পিতা প্রিন্সকে গিয়ে বলতে—" ওকে আমি ক্ষমা করিনি - মা শেষ কথা বলে গেছে - ওকে আমি অভিশাপ দিই। তাই আমিও অভিশাপ দিচ্ছি ওকে। ওকে ব'লো মা কী ক'রে মারা গেছে, কীভাবে আমি একলা ছিলাম বুবনভার বাসায়। ব'লো, কীভাবে আমায় তুমি সেখানে দেখেছিলে, সব, সবকিছু তুমি ওকে জানিও আর ব'লো যে আমি ওর কাছে না গিয়ে বরং বুবনভার কাছেই থাকতে চেয়েছি -।" সামোভার, চামড়ার বালিশ,- এ সব শব্দকে অবিকল রেখেছেন অনুবাদক। রাশিয়ান আবহের পাশাপাশি বঙ্গীয় আবহ-ও এসেছে তাঁর সৃষ্ট সংলাপে। যথা—

'কাল অবিশ্যি অবিশ্যি আসবে আমার কাছে -।'

এই বাক্যের ' অবিশ্যি অবিশ্যি' শব্দযুগল 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে যাত্রাদলের রাজকুমার অজয়ের প্রতি সর্বজয়ার উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙালিয়ানায় ভরা এধরণের আরো কিছু উদাহরণ —

জকী বলব বাপু, বিপদ যেন কাতে না, দেখছি গেরোর আর শেষ নেই!

জপত করে লোকটা আবার মরে গেল —

জকার কান ভাঙাচ্ছিস তুই?

জমা-কে খেয়েছে ওটা-- ইত্যাদি।

এখানে প্রায় প্রতিটি বক্তব্য-র মধ্যে নএতর্থকতা আছে, যা ঘটনার ঘূর্ণি ও ভয়াবহতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসের শুরুতে অবলোনস্কি পরিবারের সংকট মিটিয়ে দিতে এলেন আন্না এবং নষ্ট হয়ে গেল তাঁর নিজের পরিবার। তাঁর স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ১৮৭০-এর দশকে রুশ সমাজে ছিঁড়ে যাচ্ছিল পরিবারের বাঁধন। মস্কোতে নয়, কিন্তু পিতার্সবুর্গে 'যেমন খুশী চল' নীতিতে জীবন চলছিল। ফলে পিতার রক্ষিতা রাখা, সন্তানদের স্বেচ্ছাচার, ধার করে বড়লোকি করা - এগুলি সমাজকে আত্মনেতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সবের মিলিত ফল হল আন্নার জীবনের করুণ পরিণতি। অপরপক্ষে কনস্তানতিন লেভিন বুঝেছিলেন, যে, শ্রমশীল জীবনের অপরূপতা কর্মহীন জীবনে নেই। গ্রামের বিষয়-আশয় দেখাশোনা করতে গিয়ে তিনি কৃষকদের অনাস্থা অনুভব করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে এ অবস্থা দূর করতে গেলে নিজেদের পুরোনো জীবন আর অকেজো জ্ঞানকে বিসর্জন দিতে হবে; বেঁচে থাকার যৌক্তিকতাকে বুঝতে হবে। লেভিনের মনে নানা মতবাদের দ্বন্দ্ব - তবু তিনি আসল সত্যটা টের পেয়েছিলেন —

"যুক্তিবাদী প্রাণী হিসাবে আমরা সবাই পেটের জন্য ছাড়া আর কোনোভাবে বাঁচতে পারি না। কিন্তু ফিওদর বলে দিলে পেটের জন্য বেঁচে থাকা খারাপ, বাঁচা উচিত ন্যায়ের জন্যে; আর পলকেই আমি বুঝতে পারলাম তাকে।"

অপর পক্ষে অশান্ত, উদভ্রান্ত আন্না চিন্তার এই সুস্থতা পাননি যারা কারণ দৈনন্দিন জীবনে বিশৃঙ্খলা আর তাঁর নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। পুত্রকে কাছে পাবেন কি পাবেন না, স্বামী বিচ্ছেদ দেবেন কি দেবেন না, ভ্রনস্কি তাঁকে ভালবাসেন কি বাসেন না, তাঁকে ভালবেসে ভ্রনস্কি আসলে নিজের আত্মগরিমা চরিতার্থ করছেন কি না - চিন্তার এই সব সংকট আন্নাকে টেনে নিয়েছিল রেললাইনে স্লিপারগুলোর দিকে। তিনি ভেবেছিলেন- "ওইখানে, একেবারে মাঝখানটিতে, ওকে শাস্তি দেব; আর সবার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকেও নিষ্কৃতি মিলবে।" এবং আন্না মারা গেলেন।

লেখক এ উপন্যাসে শৈল্পিক অভিব্যাক্তি সহকারে প্রায় সর্বপ্রকার মানবিক অনুভূতির চর্চা করেছিলেন। এজন্য অবাধ কথনভঙ্গীর তেকনিক গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। এই ভঙ্গী ও ভাষা - দু'য়েরই সার্থক অনুবাদ করেছিলেন ননী ভৌমিক, যার ফলে শত জটিলতার মধ্যেও আন্না, কারেনিন, কাতিয়া, লেভিন, ভ্রনস্কি, দারিয়া - প্রতিটি চরিত্র স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল পাঠকের কাছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে এ গ্রন্থের শুরুতে রাশিয়ান নাম বিষয়ে তাঁর সম্যক আলোচনাটি অ-রাশিয়ান পাঠকের পক্ষে জরুরী। রাশিয়ানরা একই মানুষের নামকে ডাকবার সুবিধার্থে অথবা আদরার্থে বিভিন্ন ভাবে ডাকেন। আদরার্থে পাভেল হয় পাভকা, ইভান হয় ইভানুশকা। অতি আদরার্থে তানিয়া হয় তানচুরোচকা।

তৎকালীন সামাজিক ফ্যাশন অনুযায়ী দারিয়া দারেস্কা-র পরিবর্তে হ'য়ে যায় ডল্লি। আন্না আর্কাদিয়েভনা কারেনিনা - এই নামের অর্থ হ'ল শ্রীযুক্ত কারেনিন-য়ের স্ত্রী আন্না, যিনি শ্রীযুক্ত আর্কাদির কন্যা। মূল উপন্যাসে লেখক অবস্থাবিশেষে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন নামে ডেকেছেন এবং অনুবাদক একনিষ্ঠভাবে তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

অনুবাদ বিষয়ে একটি ইংরাজি উক্তি হ'ল "Translations are like women. They are either beautiful or faithful."। যে সমালোচক দু'টি ভাষাই উৎকৃষ্টভাবে জানেন, অনুবাদের দু-তরফা বিচার তিনিই সঠিকভাবে করতে পারেন। অধিকাংশের পক্ষে সাবলীল অনুবাদই হ'য়ে ওঠে 'বিউটিফুল'-এর প্যারামিটার। মহৎ সাহিত্যের তর্জমা শুধুমাত্র 'বিউটিফুল' তকমা নিয়ে পাঠকের কাছে এলেও তিনি লাভবান হন। আর ননী ভৌমিকের তর্জমা তো 'Beautiful এবং Faithful' দু'টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; তিনি অনুবাদ জাতের 'connoisseur'।

দাদুর দস্তানার মতই ননী ভৌমিকের সাহিত্যিক দস্তানার মধ্যে অনেক কিছুর আশ্রয়--ছোটগল্প, উপন্যাস, অনুবাদগ্রন্থ ইত্যাদি। ১৯৫৭-এ পাকাপাকি ভাবে মস্কোতে অনুবাদক হিসাবে চলে যান তিনি, কিন্তু তার আগেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'ধানকানা' ও 'ধুলোমাটি'। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ হ'ল ধানকানার দশটি গল্পের পটভূমি। ঐ সময়টি এ রাজ্যের পক্ষে যুগসন্ধিক্ষণ। লেখকের জীবনেও তখন নানা অভিজ্ঞতার সমাবেশ - কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য তিনি – 'স্বাধীনতা' পত্রিকার তরফে তেভাগা আন্দোলনের রিপোর্ট লেখবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন জেলায় জেলায়, পার্টি নিষিদ্ধ হ'বার পর কারাবাস করলেন কিছুদিন। এই সব সামাজিক বাস্তবতা ও শিল্পবোধের সমন্বয় ঘটেছে 'ধানকানা' -য়। যুদ্ধ, তেভাগা আন্দোলন, মন্বন্তর,পথেঘাটে মার্কিন সৈন্য, চা বাগানের চরিত্রবদল, হ্যাভস ও হ্যাভসনটস্ দের ভিড় - এ সব কিছুর সাথে আছে নানা স্বপ্নভঙ্গের কথা। ধান-বৃষ্টি-জমি-নিজের ঘোড়ার গাড়ি - সব স্বপ্নই চুরমার। ভাঙা স্বপ্নের স্তূপ থেকে জন্ম নেয় নতুন আশা ও সাহস। তাই গোরা সৈন্যের দিকে লোহার টুকরো ছুঁড়ে মারে পাঁচু তস্কর। ছোটো প্রতিবাদ বড়ো হ'য়ে ওঠে, যখন ভুটান-পাহাড়ের কোলের চা-বাগানের হটাবাহার কুলীরা পাথর দিয়ে ভরতে থাকে চা-পাতা তোলার টুকরি। 'হটাবাহার' মানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাগান ছেড়ে দিতে হবে। এই কুলীদের এলোমেলো ক্রোধের জেরে বাবুরা ইতস্ততঃ গুলি ছুঁড়ে পালিয়েছে, পরে পুলিশ নিয়ে আসবে বলে। অসমান লড়াই হবে জেনেও কুলীরা তৈরি হয়। পরিণতি-তে সবাই জীবন থেকে হটাবাহার হ'য়ে যায়। তবে লেখক এটি ব্যঞ্জনায় রেখেছেন - বাচ্যে রেখেছেন পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত রাইফেল ফায়ারিং-এর শব্দ।

'গিরস্তি' গল্পে গরু কেনবার টাকা জোগাড় করবার জন্য এগারো বছরের মেয়ে ময়ালীর বিয়ে দিয়ে ১০০ টাকা পণ পেল বানসর। হিসেব করে দেখলে এটা লোকসান, কারণ বয়স কালে বিয়ে দিলে ১৬০ টাকা পণ পেত- কিন্তু হালের গরু কেনা দরকার ছিল - তা নাহ'লে জোতদার ভাগে বন্দোবস্ত করবে না। সেই গরু দুটো যখন বন্যার কারণে হাতছাড়া হয়ে গেল, তখন ময়ালীকে শ্বশুর ঘর থেকে আনতে গেল বানসর - কিন্তু নিজের বাড়িতে না ফিরে আরো উত্তরে চলতে লাগল সে। খাটিয়ে মেয়ে ময়ালীকে উত্তরদেশের অপরিচিত কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, আটকুড়ি টাকা পণ নিয়ে, গরু কিনে, সস্তায় অনেক জমি বন্দোবস্ত করে নেবার পরিকল্পনা করেছিল বানসর। এখানে মানুষ-গরু-জমি, কন্যাস্নেহ-জমিপ্রীতি-গিরস্তিপনা এসব সমশব্দ হ'য়ে ওঠে। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নই ওঠে না - কারণ বেঁচে থাকাটাই আসল কথা। টাকা থাকলে গরু হবে, জমি হবে, আর জমি হ'লে ধান হবে। ধান মানেই জীবন।

'ধানকানা' গল্পে ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পর দেশত্যাগী মানুষেরা ফিরতে লাগল স্বভূমিতে - উত্তরবঙ্গের দুর্গাপুর গ্রামের আঁধারু-ও এল তাদের সঙ্গে। দিনপিছু একটাকা মজুরিতে কোদাল চালিয়ে District Board এর রাস্তা মেরামত করবার কাজ পেল বটে, কিন্তু মনে হতে লাগল ধান-কাটার খাটুনিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভোর রাতের শীতে ছেঁড়াকাঁথা জড়িয়ে হিমে-ভেজা ধানের গোড়ায় হাত দিলে একটা আশ্চর্য স্পর্শ পাওয়া যায়। এই অনুষঙ্গে ক্রমানুযায়ী চাষগুলির কথা মনে পড়ে তার - আমন উঠে গেলে রবি, তার পর পাট, পাট উঠে গেলে সরষে - প্রত্যেকটি ফসলে ছড়িয়ে আছে নতুন অঙ্কুরের মত প্রত্যাশা। মাটিকাটার মজুরি নিয়ে গ্রামে ফিরে নিজের বন্ধকী জমি ছাড়াতে গিয়ে আঁধারু দেখে যে, জোতদার সে জমি গ্রাস করে ধানকল বসিয়েছে। আঁধারু মামলা করার কথা ভাবে। পরের ঘটনা বাদ দিয়ে যান লেখক। শেষে দেখা যায় সে আবার ফিরে গেছে মাটিকাটার কাজে; এবার দিনে দশ-আনা মজুরি। নিজের জমির ধানকাটার স্বপ্ন তার আর সফল হবে না!

'একটি দিন ১৯৪৪' - কাহিনীহীন এই গল্পটি প্রকাশিত হ'য়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়। কলকাতা শহরে একদিনে যা যা ঘটতে থাকে, তারই কোলাজ এই গল্পটি। মার্কিন সৈন্যরা সর্বত্র ছবি তুলে বেড়ায়। শহর থেকে পচা-চাল সংগ্রহ করতে গিয়ে গয়লা-বৌ আর গ্রামে ফেরে না। বাচ্চারা 'ইনকিলাব' শ্লোগান দেয়, ইয়াসিন মুখ বুজে বিড়ি বাঁধে, শকুন্তলা কাজ না করে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, সমরসচিব 'ভারতীয় চা' পান করতে করতে 'দেশী খবর' পড়েন। প্রাত্যহিক এই কাজগুলির বর্ণনা থেকে অনুভূত হ'তে থাকে যে শহরটা বিত্তবান আর বিত্তহীন, এই দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে গেছে। 'নবান্ন' নাটকের কথা মনে পড়ে যায় আমাদের।

'ধানকানা'-র অনেকগুলি তুকরো বিষয় 'ধুলোমাতি'-র মধ্যে যৌগিক চেহারা নিয়েছে। এখানেও আছে কাত্তের অভাবে ক্লান্ত রিনি, চা বাগানে লোকসান, পুলিশসাহেব হকার্তের অত্যাচার এবং প্রতিরোধের চেষ্টা। 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এ উপন্যাস আসলে পঞ্চাশের দশকের ইতিহাস। ৪-তি ভাগ এ উপন্যাসের - ধুলো, ঝড়ের দিন, দিনরাতের ঝড়, মাতি। নানা স্বপ্নের ত্মমৃত্যুর কাহিনী এতি। রামচন্দ্র চৌধুরীর বাসনা ছিল নিত্তের হাতে কিছু তৈরি করা। শিবেন্দ্র-র স্বপ্ন ছিল সন্ত্রাসবাদের পথে দেশের মুক্তি ও উন্নতি। সত্যবাবুর আদর্শ ছিল অহিংসার পথ। এগুলি ভাঙা স্বপ্ন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ পূর্ণবাবু নানা চেষ্টায় সংসারতাকে বাঁচিয়ে রাখেন। রমেশবাবু রাত্নীতির নতুন আদর্শ গ্রহণ করেন। সত্যবাবুর সাথে তিনি বিপদ আর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁতে যান দুর্ভাগ্য পর্যন্ত - সেখানেই তাঁরা সৌভাগ্যের মন্ত্র খুঁত্বেন। নিত্তেকে শিবুর উপযুক্ত ক'রে তোলার ত্ন্য প্রতিমা-ও তাঁদের সঙ্গ নেয়। অমলের ভালবাসার হাত ধরে খুকী বেরিয়ে আসে শ্বশুরবাড়ি থেকে। ইয়াসিন নিত্তের ছেলে আবদুলের সাথে ত্তার দিদির বিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সামাত্তিক প্রথার বদল ঘতায়। সকলকে ভালবেসে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য থেকেও বাঁচার উপায় খুঁতে নেন শিবেন্দ্র-র মা মোহিনীদেবী। মানুষকে ভালবাসতে পারাই তাঁর শক্তি। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আর রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আশ্রয় করে মনোবল ফিরে পান। বীরু কলকাতায় যায়। ত্বীবন তার নিত্স্ব দিকনির্দেশে চলতে থাকে। পুরোনো আর অকেত্তেকে বর্ত্ন করার এই প্রক্রিয়া 'আন্না কারেনিনা' -র লেভিনের কথা স্মরণ করায়। কাদায় আর ময়লার মধ্যে, হঠাৎ খোলস ফেতে মাথা তোলে নতুন আশার অঙ্কুর।

ধুলোর ঝড় আসে। তার ওপর পড়ে পরিশ্রমের ঘাম, আত্মত্যাগের রক্ত। সৃষ্টি হয় মাতির - তার ওপরেই দাঁড়াবার ত্বয়গা। গাছের শিকড়ও ত্বানে, মাতি শুকনো, শক্ত - কিন্তু মাতি মানেই ত্বীবন।

উপন্যাসতিকে 'অসাধারণ' আখ্যা দিয়েছিলেন মতি নণ্ডী। ভাষার অনবদ্যতা এ-র একতি কারণ। উদাহরণ দেওয়া যাক ---

ত্ব(প্রাণের মা-র) 'ত্বমা আর কাপড়তা পড়েই রইল ধুলোর মধ্যে। গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াল এখানে-ওখানে--। তারপর খসে খসে, গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো হ'য়ে মিশে গেল শহরতা স্মৃতিহীন লাল ধুলোর রাশিতে। দিনের বেলা সে ধুলোর ওপর আপন মনে ত্বলে সূর্য। রাত্রে অপলক চেয়ে থাকে এক আকাশ তারা।'

"দান হিসেবে না পেয়ে ভালবাসা তোরা অর্ত্ন করে নিতে শেখ।"

এ ভাষা যেন কবিতার ভাষা।

'ধুলোমাতি' উপন্যাসের ত্ন্য ১৯৮৯-তে 'বঙ্কিম পুরস্কার' পেয়েছিলেন ননী ভৌমিক, আর তিন বছরের মধ্যে তা ভুলে গেছিলেন। রাশিয়ান ভাষার ঐশ্বর্যময় ত্তাতে বাঙালী পাঠককে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ত্বীবনের ভালো ও মণ্ড সব অভিজ্ঞতাকে তর্ত্মা করে দিয়েছিলেন কাগতে-কলমে; কিন্তু বিদেশে পুত্রের অকালমৃত্যু এবং দুঃসহ দারিদ্র্য বোধহয় তর্ত্মার অতীত হ'য়ে তাঁর মনের কিছু অংশ মুছে দিয়েছিল। কালের নিয়মে এখন সোভিয়েত দেশ নেই। ননী ভৌমিকও চলে গেছেন। তাঁর অত্স্র অনুবাদগ্রন্থ গুলির মধ্যে দু-একতির বিলম্বিত সংস্করণ এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিতে অনুবাদক হিসাবে কারোর নাম থাকে না। মৌলিক গ্রন্থ গুলিও দুষ্প্রাপ্য। ননী ভৌমিকের নিত্তের স্মৃতি মুছে গেছিল; তিনি নিত্তেও পাঠকের স্মৃতি থেকে বোধহয় মুছে যেতে চলেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. ইউক্রেনের লোককথা (দস্তানা, রায়বাহাদুর মার্ত্তরচাঁদ, বেড়াল আর মোরগ ছানা, গড়ানে মতর, বুড়োর মেয়ে আর বুড়ির মেয়ে, তেলেসিক ইত্যাদি গল্প) - রাদুগা, ১৯৮৮

২. পেনসিল আর সর্বকর্মার অ্যাডভেঞ্চার (ইউরি দ্রুত্কভ) - প্রগতি, ১৯৭৪

৩. বাচো আর গোচা (ওতিয়া ইউসেলিয়ানি) - প্রগতি, ১৯৭৫

৪. সোনার পেয়ালা (কায়ুম তাংগ্রিকুলিয়েভ) - রাদুগা, ১৯৮৯

৫. সোনার চাবি কিংবা বুরাতিনোর কান্ডকারখানা (আলেক্সেই তলস্তয়) - রাদুগা, ১৯৮৮

৬. উভচর মানুষ (আলেক্সাণ্ডর বেলায়েভ) - রাদুগা, ১৯৭৩

৭. বঞ্চিত লাঞ্ছিত (ফিওদর দস্তোয়েভস্কি) - প্রগতি, ১৯৭৮

৮. আন্না কারেনিনা ২ খন্ড (লিও তলস্তয়) - রাদুগা,১৯৮৩

৯. ধানকানা (ননী ভৌমিক) - অরুণা প্রকাশনী, ১৯৪৬

১০. ধুলোমাতি (ননী ভৌমিক) - অরুণা প্রকাশনী, ১৯৫৬

১১. সাপ্তাহিক প্রতিদিন - রবিবার - ২৬.০৬.২০১১